# রাষ্ট্রীয় বিধান পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতা

–ড. হাসনান আহমেদ

সেই ছোটবেলা থেকে প্রবাদবাক্যটা শুনে আসছি, 'চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী'– তা সে সিঁদেল চোর হোক বা জাহাজ চোর হোক। আবার 'ছাগল ধরিয়া যদি বলো কানে-কানে, চরিতে না-যেও বাবা ফলের বাগানে', কথাটাও শুনেছি। ছাগল কি ফলের চারা-গাছের কচি পাতা খাওয়া বন্ধ করে দেবে? কী করণীয়? আজীবন কি ধর্মের কাহিনী শুনিয়ে যাবেন, নাকি ছাগলের স্বভাবকে পরিবর্তন করবেন? কোনোটাতেই কাজ হবে না; প্রয়োজনে বেড়া দিতে হবে। আইন তৈরি করতে হবে এবং আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করে চৌর্যবৃত্তি বন্ধ করতে হবে। চোর ও ছাগল কি আইন তৈরি করে তাদের হাত ও মুখ বেঁধে রাখতে চাইবে? কখনও না, 'যার যে স্বভাব, যায় না সে ভাব'। কাকে দিয়ে বিধানটা পরিবর্তন করবেন? অন্তর্বর্তী সরকার গণভোটের মাধ্যমে অনুমতি নিয়ে একাজ করবে। বিধান পরিবর্তনের এখনও উপযুক্ত সময় আসেনি। আগে আইনশৃঙ্খলার স্থিতিশীলতা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে ঢেলে সাজানো। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। অতপর গণভোটের আয়োজন, সংবিধান পরিবর্তন, বিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠান, ক্ষমতা হস্তান্তর। আমার এ লেখা যথাসময়ের আগে হচ্ছে এই কারণে যে, বিষয়টা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক আলোচনা, মতামত রয়ে গেছে। তাদের লেখা পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর পত্রিকায় প্রকাশিত পক্ষে-বিপক্ষের সব লেখা সংরক্ষিত করে কমিটির সামনে বিবেচনার জন্য পেশ করতে পারে।

জানি বিধান পরিবর্তন বিষয়ে বিস্তারিত লেখা এত স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। আমি দফাগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। বিধানের মূলনীতিতে পরিবর্তন আবশ্যক। ঘোষণাপত্রে স্বাধীনতার উদ্দেশ্য লেখা ছিল– সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। এগুলোকে প্রতিস্থাপিত করে সাথে আরও দুটো মূলনীতিকে যোগ করা যায়– ধর্ম-সম্প্রদায় অহিংসতা এবং গণতন্ত্র। ধর্মনিরপেক্ষতা একটি ধর্ম না-বোধক শব্দ, উঠিয়ে দেওয়াই ভালো। রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সব নাগরিক, সব ধর্মই সমান। এরপর সরকার ও রাষ্ট্রের কাঠামো পরিবর্তনই মূল কাজ।

সরকার কাঠামোতে রাজনৈতিক দল এবং ক্ষমতাসীন সরকারি দল অসীম ক্ষমতার অধিকারী। এ সুযোগটাই রাজনৈতিক দল নিচ্ছে। রাজনৈতিক দলই এদেশে সব অন্যায়ের সুতিকাগার। সব রাজনৈতিক দলকে বিধান পরিবর্তন করে জবাবদিহিতা, ও দায়বদ্ধতার মধ্যে আনতে হবে। ট্রায়াল এন্ড এরোর অনেক বছর ধরে করলাম, ওদিকে না যাওয়াই ভালো। কারণ যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, পুরোনো অভ্যাস ত্যাগ করতে পারবে না জানি। প্রতিটা দলে ভালো স্বভাবের লোকের তুলনায় খারাপ প্রকৃতির নেতা-কর্মীর সংখ্যা অত্যধিক। মানুষের মন তো কোনো যন্ত্রের ইঞ্জিন নয় যে, ইচ্ছে করলেই বদল করে ফেলা যাবে। যে মানুষটা মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য একবার হারিয়েছে, তা কোনোদিনই আর ফিরে পাবে না। বিষয়টা সাইকোলজিক্যাল। এদেশের প্রত্যেক ব্যক্তির রাজনীতি করার অধিকার থাকবে বটে কিন্তু সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারীদের সংশ্লিষ্ট দলের সদস্যপদ নিতে হবে। যে কোনো কর্মী বা নেতার অন্যায় কার্যকলাপের জন্য সংশ্লিষ্ট দলকে জবাবদিহি করতে হবে। শুধু নামমাত্র বহিষ্কার করা এবং মনে মনে আবার দলীয় কার্যক্রম ও যত অপকর্ম তাকে দিয়ে সমাধা করা বন্ধ করতে হবে। নইলে ওই দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার তো আমরা মনোযোগ দিয়ে বহু বছর ধরে দেখলাম। এটাও এনায়কতন্ত্রের নামান্তর। দেশের যত অপকর্মের হোতা, চোরাকারবারি, দুর্নীতিবাজ, টাকার বিনিময়ে সংসদের দলীয় সদস্যপদ কেনা, তার নির্বাচিত এলাকার মধ্যমণি হয়ে সব সরকারি উন্নয়ন বরাদ্দের ভাগবাঁটোয়ারা করা, এলাকার বিভিন্ন পক্ষ ও সমিতি, যেমন– দোকান মালিক সমিতি, ইটভাটা মালিক সমিতি, মুরগি খামার সমিতি, নেশা প্রতিরোধ সমিতি ইত্যাদি থেকে অবৈধ টাকা রোজগার করার ফাঁদ তারা তৈরি করেন। আমরা জানি, প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ আছে। কাজ পরিচালনা ও সম্পাদনের জন্য প্রতিটা বিভাগে কর্মকর্তা আছেন। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় অর্থের বণ্টন ও উন্নয়ন কাজে অর্থের লেনদেন এবং অর্থ ও অনুদান সংশ্লিষ্ট ভাগবাঁটোয়ারার কোনো বিষয় ও ক্ষমতা থেকে সংশ্লিষ্ট এমপিকে দূরে রাখার বিধান থাকবে। এতে সরকারি টাকায় নিজের দলের

লোকজন প্রতিপালন ও নিজের পকেট ভারী করার চলমান বাস্তবতার অবসান হবে। ফলে এমপি হওয়াটা কোনো লাভজনক পেশা হবে না। অর্থসংকট অথচ সুশিক্ষিত ব্যক্তি রাজনীতিতে আসবেন। দশ কোটি টাকা ব্যয়ে দলীয় নোমিনেশন কেনা, আরো বিশ কোটি খরচ করে নির্বাচনে জেতার চেষ্টা করা এবং পাশ করে হাজার কোটি টাকা কামানো ইত্যাদি ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা যাবে।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত পদ্ধতি পরিহার করে রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন। জনগণ প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ও জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এ পদ্ধতির ব্যবহার ও ভোটের মাধ্যমে যোগ্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনেক সহজ। তাতে সমাজের কালা জাহাঙ্গীর, মুরগি মিলন গং যেমন এমপি হওয়ার স্বপ্ন দেখবে না, আবার এমপি আনার গংও এমপি হতে পারবে না। রাষ্ট্রপতিসহ প্রত্যেক এমপি, এলাকার নেতা-কর্মীকে কৃতকর্মের জন্য সংশ্লিষ্ট দল ও রাষ্ট্রের কাছে জবাবদিহি করতে ও দায়বদ্ধ থাকতে হবে। এছাড়া ক্ষমতাসীন দল ও অন্যন্য রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড জনস্বার্থবিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী হচ্ছে কিনা রাষ্ট্র তা তদারকি করবে। রাষ্ট্রীয় প্রধান যদি একজন হন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী নিজ দলের অনুগত কাউকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্রপতি বানিয়ে ফেলবেন। তিনি জনগণের কল্যাণ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ দেখার পরিবর্তে দলীয় কল্যাণ বেশি দেখবেন ও ঠুটো জগন্নাথে পরিণত হবেন। এটা পদের জন্য মর্যাদাহানিকরও বটে। যে কোনো সময় ক্ষমতাসীন দলের মনমতো না চলতে পারলেই পদচ্যুতি ঘটে। এর আগেও আমরা এদেশে এটা দেখেছি।

বিকল্পভাবে রাষ্ট্রীয় প্রধান একজন হবেন না, বরং একটা টিম এ দায়িত্ব পালন করবে। দলনিরপেক্ষ দেশবরেণ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে এ টিম গঠিত হবে। টিমের একজন প্রধান থাকবেন। এ টিমের নাম হবে 'সুপ্রিম কাউন্সিল'। রাষ্ট্রের স্বার্থ ও জনগণের স্বার্থ দেখভালের জন্য এ টিম কাজ করবে। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বলা যায়: সরকারের কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের আচর-আচরণ, রাজনৈতিক দলের জনসেবা ও দেশসেবার মানসিকতা 'সুপ্রিম কাউন্সিল' পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। সুপ্রিম কাউন্সিলেরও ক্ষমতার পরিধি, ক্ষমতা ও দায়বদ্ধতা সংবিধানে বর্ণিত থাকবে। কাউন্সিলরের সংখ্যা ১৫ থেকে ২১ জন হতে পারে। সর্বোচ্চ ভোট অর্জনকারী হবেন 'প্রধান সুপ্রিম কাউন্সিলর'। সরকারের মেয়াদ ৫ বছর হওয়ায় কাউন্সিলের মেয়াদ ৪ বছর বা ৬ বছর হবে।

সুপ্রিম কাউন্সিল গঠনের জন্য বিভিন্ন অরাজনৈতিক পেশাদার সংগঠনের মধ্য থেকে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমপক্ষে দুই লাখ নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করতে হবে। তাদের প্রত্যক্ষ ভোটে সুপ্রিম কাউন্সিল গঠিত হবে। বিধানে নির্বাচকমণ্ডলী ও কাউন্সিলর হওয়ার যোগ্যতার উল্লেখ থাকবে। তাদের সৎ ও দলনিরপেক্ষ ব্যক্তি হতে হবে। কাউন্সিলে রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ২/৩ ভাগ কাউন্সিলর এবং সাধারণ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরের সম্মতির প্রয়োজন হবে। রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ বিষয়গুলো বিধানে উল্লেখ থাকবে। রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ পরিচালনার ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্বাচিত সরকার ও সুপ্রিম কাউন্সিলের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা বিধানে উল্লেখ থাকবে। সেনাবাহিনী, দুদক, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, নির্বাচন কমিশন, মানবাধিকার কামিশনসহ আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সংস্থা সুপ্রিম কাউন্সিলের অধীনে থাকবে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী-কর্মকর্তা ক্ষমতাসীন রাজনীতির তোষামোদকারী হয়ে পদোন্নতি, অবৈধ আর্থিক সুবিধা, অতিরিক্ত ক্ষমতা ও দুর্নীতি করে যারপরনাই লাভবান হচ্ছে। বিষয়টি সরকার ও সুপ্রিম কাউন্সিলের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্ধারণের সময় বিবেচনায় আনতে হবে। দেশে নির্বাচনের সময় সুপ্রিম কাউন্সিল দায়িত্ব পালন করবে। 'সুপ্রিম কাউন্সিল নির্বাচনে' নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালন করবে। সুপ্রিম কাউন্সিল প্রয়োজনবোধে নির্বাচনকালীন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনের জন্য কিছু দলনিরপেক্ষ ব্যক্তিকে মনোনীত করতে পারবে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত রাখতে হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় গ্রাম-গঞ্জে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এবং সালিশ-দরবারসহ প্রতিটা বিষয়ে দলবাজি ও টাকার খেলা উন্মুক্তভাবে চলছে। স্থানীয় সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

দেশে কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন থাকতে পারবে না। এদেশের কোনো নাগরিককে রাজনীতি করতে হলে সাধারণ সমাজে এসে রাজনীতি করতে হবে। নইলে বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের দৌরাত্ম্যে প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু কাজকর্মের পরিবেশ যেমন নষ্ট হয়ে গেছে, ভবিষ্যতেও তা-ই হবে। প্রতিষ্ঠানে কাজকর্ম ও সেবা দানের পরিবর্তে রাজনৈতিক আনুগত্য ও দলবাজি মূখ্য হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক আনুগত্যের মাধ্যমে পদ ও অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার উন্মুক্ত ব্যবসা চলছে। এখান থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত দেশের সুষ্ঠু পরিবেশ, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে অসম্ভব।

প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষক রাজনীতি আইন করে বন্ধ করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের দেশ-সচেতন করে তুলতে হলে প্রতিটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটা অরাজনৈতিক কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন থাকবে। তারা ছাত্রছাত্রীদের ন্যায্য অধিকার, দেশ ও শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলবে। এছাড়া প্রতিটা ফ্যাকাল্টিতে ছাত্রছাত্রীদের কো-কারিকুলার ও এক্সট্রা-কারিকুলার এ্যাকটিভিটির জন্য একাধিক ক্লাব বা ফোরাম থাকতে পারে। দলীয় লেজুড়বৃত্তি, রামদা-চাপাতির ট্রেইনিং, চাঁদা আদায় করে ধনী হওয়ার জন্য ছাত্র রাজনীতি চলতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রধান কাজ সময় দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া ও গবেষণা করা। কোনো রাজনৈতিক দলের দলীয় প্রধানের মিটিংয়ে সামনের সারিতে সোফায় বসে গালে হাত দিয়ে নেতা-নেত্রীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে চোখের ভাষায় বোঝানো যে, 'আমি তোমারি, ভুলনা আমায়'; কোনো উপাচার্য বা শিক্ষাবিদের এটা মানায় না। এ ধরনের কাজ-কারবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অপমানজনক ও মর্যাদাহানিকরও বটে।

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষা-পরিবেশের উন্নয়ন, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট বিক্রির ব্যবসা বন্ধ ইত্যাদি করতে শিক্ষা-মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি ব্যর্থ হয়েছে। অথচ শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সবার জন্য শিক্ষা ছাড়া এদেশের উন্নতি ও বিশ্ব-দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা কল্পনাই করা যায় না। অথচ এই জনবল দিয়েই তা সম্ভব। প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থায় সঠিক নির্দলীয় পরিকল্পনা ও বাস্তবধর্মী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া। এজন্য আলাদাভাবে সাংবিধানিক আইন করে আলাদাভাবে একটা স্থায়ী 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন' তৈরি করা, যার কার্যাবলি ও কর্মের আওতা সংবিধানেই লেখা থাকবে। অতি সংক্ষেপে বললে এর কাজ হবে: পুরো শিক্ষাব্যবস্থার নীতিনির্ধারণ, কর্ম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন। দেশের সামগ্রীক শিক্ষাব্যবস্থা এর আওতাধীন হবে। প্রাইমারি স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এর কাজের বিস্তৃতি হবে। এ কমিশন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক গড়তে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগসহ প্রয়োজনে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের যোগ্যতা যাচাইসাপেক্ষে বিদ্যমান শিক্ষকদের মধ্য থেকে অযোগ্য শিক্ষকদের বেছে স্বেচ্ছা অবসরেও পাঠাতে পারবে। কারণ একজন অযোগ্য শিক্ষক মানে কমপক্ষে ত্রিশ বছর ওই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তি। ভালো শিক্ষক আনার জন্য প্রয়োজনে আলাদা পে- স্কেল দেওয়ার সুপারিশও করা যাবে। কওমি মাদ্রাসাসহ সব মাদ্রাসায় ধর্মশিক্ষা বজায় রেখে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা চালু করা প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বাড়ানো জরুরি। এজন্য প্রথমেই এদেশের সংস্কৃতি, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের মূল্যবোধ, সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখে সদ্য প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি রিভিউ করতে হবে। আমার বিশ্বাস, বেশ কিছু শ্রেণির টেক্সট, মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন করতে হবে। সার্বিক বিবেচনায় দশম শেণি পর্যন্ত 'ইন্টিগ্রেটেড শিক্ষাপদ্ধতি' এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষা (জীবনমুখী শিক্ষা, মনুষ্যত্ববোধ-সঞ্চারক শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষা) চালুর কোনো বিকল্প নেই। বিধান পরিবর্তনের আরো অনেক কথা বারান্তরে বলার আশা রাখি।

(২৮ আগস্ট ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর বাতায়ন কলামে প্রকাশিত)

**ড. হাসনান আহমেদ:** অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও গবেষক; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ